দেখতে থাকলো যতক্ষণ দৃষ্টিপথে দেখা যায় তাদের।

মোড়ে বাঁক ঘুরে বড় রাস্তায় নামলো ওরা। বটগাছ তলায় খান চারেক রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে। চালকরা গামছা বিছিয়ে শুয়ে বসে সওয়ারীর প্রতীক্ষা করছে। ভদ্রলোক চলার গতি কমিয়ে মিনতির পানে চাইলেন।

কাঁপা কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলেন, "খোকন বেঁচে আছে?"

মিনতি উদ্যত অশ্রুধারা কোন মতে রোধ করে মাথা নাড়লো।

ওদের আগমনে রিক্সাওলাদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিলো, "রিক্সা মাইজী?"

মিনতি একটা রিক্সায় উঠে বসে বললো, "স্টেশন।"

"কোই ফিকির নেহী মাইজী। এই হট্‌কে ----।", জোর বেগে পথ কেটে রিক্সা ছুটে চললো স্টেশন পানে।

হরিহর মুখুটি একদৃষ্টে মিনতির যাওয়ার পথে চেয়ে রইলেন। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে চলন্ত রিক্সায় বসে আছে মিনতি। এইবার রাস্তার বাঁকে মিলিয়ে গেল রিক্সাটা। কম্পিত হাতে চশমা জোড়া চোখ থেকে খুলে ধুতির খুঁটে মুছে নিয়ে আবার পরলেন হরিহর মুখুটি। আরও কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন রাস্তার বাঁকের দিকে। তারপর হন্ হন্ করে বাড়ির পথ ধরলেন। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে মাথা চন্ চন্ করছে তাঁর। গলা, বুক, সর্ব শরীর শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে যেন। বুকফাটা তেষ্টায় ছট্‌ফট্ করতে করতে মরীয়া পদক্ষেপ এগিয়ে চললেন দুস্তর মরুপ্রান্তরে দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের মত ----।

চণ্ডীপুরের ভয়ঙ্কর

কথা ছিল নীতীশ নিজে স্টেশনে থাকবে। কিন্তু তার টিকিটিও দেখতে পেলো না ওরা। সুজন সারা প্ল্যাটফর্ম বার তিনেক চক্কর দিয়ে এলো। নাঃ সত্যিই আসেনি নীতীশ। অথচ শুক্কুরবার নিজে পোস্টাপিসে গিয়ে টেলিগ্রাম করে এসেছে সুজন। সে টেলিগ্রাম শনিবার সকালে না হোক, দুপুর নাগাদ পৌঁছে যাবার কথা - গ্রাম বলে চণ্ডীপুর এমন কিছু দুর্গম স্থান নয়, রাস্তাঘাট সবই আছে।

শৈলেন বেঞ্চে বসে ওদের জিনিস পত্তর আগলাচ্ছিল। সুজনকে শুকনো মুখে ফিরে আসতে দেখে শুধোলো, "কি করবি এখন?"

অবশ্য করণীয় একটাই - গন্তব্যস্থল অভিমুখে রওনা দেওয়া। স্টেশনের যা ছিরি, এখানে বেশীক্ষণ থাকার মানে হয় না। ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শ্রান্তি সীমা ছাড়ানোর আগেই আস্তানায় পৌঁছে যাওয়া উচিত। কারণ এখানে সেগুলো মেটাবার উপকরণ দুষ্প্রাপ্য। সম্বলের মধ্যে দুখানা সিমেন্ট বাঁধানো বেঞ্চি আর একটা জলের কল। চামচিকে চেহারার যে ছেলেটা খানিক আগে কাঠের ট্রে-তে করে তেলেভাজা নিয়ে ঘুরছিল, ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছাড়ামাত্র সে ও কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু রওনা দিতে চাইলেই তো আর হল না, যানবাহন চাই। নীতীশকে না দেখে ওদের মুষড়ে পড়ার প্রধান কারণ সেটাই। ওর সঙ্গে জীপ কিংবা গরুর গাড়ি কিছু একটা থাকতোই। এখন এই তিন ক্রোশ পথ ওরা যায় কি করে? সঙ্গে লটবহর যা আছে বেশি না হলেও উপেক্ষা করার মত নয়। তাছাড়া বন্ধুর আমন্ত্রণে ছুটি কাটাতে এসে বাক্স-বিছানা মাথায় করে রাস্তা দিয়ে মার্চ করতে করতে যাওয়াটা কোন কাজের কথা নয়। সব কিছুরই স্থান-কাল-পাত্র আছে।

দুই বন্ধু অথ কিং কর্তব্য তাই চিন্তা করছে, এমন সময় একটা জীপ

এসে স্টেশনের বাইরে থামলো। পুলিসের পোশাক পরা দু'জন লোক হন্তদন্ত হয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকে এদিক ওদিক দেখলো। তারপর হন্যে হয়ে ক'টা চক্কর লাগালো চারিদিকে। খানিক আগে সুজন ঠিক যা করছিল। চারিদিক খুঁজে পেতে তারপর চিন্তিত হতাশ মুখে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করতে লাগলো। শৈলেন পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ওদের দিকে।

ওরা বলছে, "এই সাড়ে আটটার ট্রেনেই তো আসার কথা ছিল ।"

"জীপ না দেখে অন্য কোনও ব্যবস্থা করেননি তো? নাঃ, তাই বা কি করে সম্ভব ----।"

শৈলেন অমায়িকভাবে একটু কাশলো। তারপর আর একটু এগিয়ে ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

সপ্রতিভ কণ্ঠে শুধোলো, "আপনারা কি কাউকে রিসিভ করতে এসেছেন?"

লোক দু'টো বিপন্ন গলায় বললো, "আজ সকালের ট্রেনে আমাদের সাহেবের আসার কথা ছিল। মাঝ রাস্তায় জীপের চাকা পাংচার হয়ে গেল। চাকা পাল্টে স্টেশনে এসে দেখি ট্রেন চলে গেছে কখন। উনি এলেন কিনা বুঝতে পাচ্ছি না।"

শৈলেন বললো, "কই সেরকম কাউকে তো নামতে দেখলাম না। আমরা দু'জন ওই ট্রেনটাতেই এসেছি। গ্রামের জনকয়েক লোক নামলো। মেয়েপুরুষ বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে আট দশজন হবে। মালপত্তর হাতে-মাথায়-পিঠে নিয়ে দল বেঁধে হাঁটাপথে রওনা দিল তারা।"

লোকদু'টোর মুখে প্রসন্নতার আভাস দেখা দিল এতক্ষণে। নতুন দারোগাসাহেব স্টেশনে পা দিয়ে প্রথম দিনেই অভ্যর্থনার এই সাঙ্ঘাতিক গাফিলতি কি আর বরদাস্ত করতেন? আপাতত চেপে গেলেও তাঁর অপ্রসন্নতা পরে অন্য কোনও রূপ ধরে আত্মপ্রকাশ করতোই। তদ্দিন ফাঁড়াটা খাঁড়ার মত ঝুলতে থাকতো তাদের মাথার উপর, গলদেশ লক্ষ্য করে। শৈলেনের কথায় আশ্বস্ত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো ওরা।

বদান্যতার সুরে প্রশ্ন করলো, "আপনারা কোথায় উঠছেন?"

শৈলেন মনে মনে এই প্রশ্নটারই প্রতীক্ষা করছিল। বলতে কি এরই প্রস্তুতি চলছিল এতক্ষণ ধরে। মুখে চোখে রাজ্যের অসহায়তা ফুটিয়ে নিজেদের অবস্থা - সঙ্কটের কথা জানালো। শুধু ও যে এর আগেও দু'বার চণ্ডীপুরে বেড়িয়ে গেছে সেই অপ্রয়োজনীয় তথ্যটুকু সযত্নে চেপে

গেল।

পুলিসের লোকদু'টো গলায় উৎকণ্ঠা ফুটিয়ে বললো, "তাই তো! অজানা অচেনা জায়গায় ----।"

দু'জনে খানিক শলা-পরামর্শ করলো। শৈলেনের সামনেই। দারোগাসাহেবের আসার সম্ভাব্য পরবর্তী ট্রেন রাত ন'টায়। এগারো ঘণ্টা জীপ নিয়ে ঠায় অপেক্ষা না করে ওদের বোধহয় লালগঞ্জে ফিরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হ'বে। নিজেদের অসুবিধার কথা ভাবছে না ওরা। দরকার পড়লে সমস্ত দিন স্টেশনে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকতে পারে, কিন্তু ওদিকে থানার লোকগুলোকেও যে তটস্থ হয়ে থাকতে হ'বে ততক্ষণ। তাদের কাছে খবরটা পৌঁছনো দরকার। শৈলেন নিস্পৃহ মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। লোক দু'টো কথা থামিয়ে ওর দিকে তাকালো।

"চণ্ডীপুর তো লালগঞ্জ যেতে পথেই পড়ে। আমরা আপনাদের ওখানে ছেড়ে দেবো'খন।"

শৈলেন ধন্যবাদ জানিয়ে পত্রপাঠ কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে স্যুটকেস ও বেডিং হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে হাঁক দিলো, "চলে আয় সুজন।"

ধুলো-ওড়া এবড়ো-খেবড়ো পথে ঝাঁকানি খেতে খেতে চললো ওরা। এক জায়গায় এসে জীপ থামলো।

ড্রাইভার বললো, "নামুন এবার, চণ্ডীপুর এসে গেছে।" ওরা জিনিসপত্র নামিয়ে আরেক দফা ধন্যবাদ জানালো।

ড্রাইভার হাত নেড়ে খানিক দূরে দেখিয়ে বললো, "ওই হ'ল গিয়ে আপনাদের চণ্ডীপুর। একটু সাবধানে যাবেন। এখানে বাঘের উৎপাত চলছে আজকাল।"

সুজন বললো, "বাঘ মানে?"

অপর লোকটা চলন্ত জীপের জানলা থেকে মুখ বার করে বললো, "বাঘ জানেন না মশাই? রয়েল বেঙ্গল টাইগার ----।"

সুজনের হতভম্ব মুখের দিকে চেয়ে শৈলেন বললো, "বোধহয় কাছেপিঠে নাক্‌শাল্‌দের আড্ডা-টাড্ডা আছে কোথাও। সেই কথাই বলছে ----।"

"যেমন আশুতোষ মুখুজ্যেকে বলতো বাংলার বাঘ। তাই বল। আমি ভাবলাম বন নেই জঙ্গল নেই এখানে আবার বাঘ এলো কোত্থেকে !"

মেঠোপথে খানিক দূর গিয়ে দালানওলা বড় একটা বাড়ির কাছে পৌঁছলো ওরা।

বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলো, "নীতীশ! নীতীশ!"

দোতলার জানলা দিয়ে মুখ বার করে নীতীশ বললো, "কে?"

শৈলেন বললো, "দরজা খোল শীগ্গীর। তোরা দেখি কলকাতার কান কাটবি। দিনের বেলা দরজা টরজা সব এঁটে বসে আছিস।"

নীতীশ দ্রুতপায়ে নীচে এসে দরজা খুলে প্রশ্ন করলো, "আমার টেলিগ্রাম পাসনি?"

শৈলেন ও সুজন বিস্মিত হয়ে বললো, "তার মানে?"

"দাঁড়া আগে ভিতরে আয়।" তিনজনে ধরাধরি করে মালপত্র ভিতরে আনলো।

নীতীশ দরজায় হুড়কো তুলে দিয়ে বললো, "আয় বোস।"

তক্তপোষে বসতে বসতে শৈলেন শুধোলো, "কি ব্যাপার বলতো?"

নীতীশ জানালো, কিছুদিন থেকে দারুণ প্যানিক চলছে গাঁয়ে। একটা মানুষখেকো বাঘ এসে আড্ডা গেড়ে বসেছে চণ্ডীপুরে। কাল রাতে তার চতুর্থ বলি হিসেবে নীতীশদের বামুনঠাকুরের ঘাড় মটকেছে। আজ ভোর রাতে শ্মশানে গিয়ে তাকে দাহ করে এসেছে ওরা।

"যাক এসে পড়েছিস্ যখন, সবই জানতে পারবি। আমি আর এই বিপদের মুখে তোদের আনতে চাইনি। সুজনের তার পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম পাঠালাম আসতে মানা করে। সে টেলিগ্রাম বোধহয় তোরা রওনা দেবার পর পৌঁচেছে ----।"

"পুলিস কি বলে?"

"পুলিস আবার কি বলবে? ইলেকশনের হিড়িকে তাদের নিশ্বেস ফেলার ফুরসৎ আছে নাকি? লালগঞ্জে কয়েকবার লোক পাঠানো হয়েছিল, মহাপ্রভুরা একবার এসে দাঁড়ালো না পর্যন্ত।" তারপর একটু

থেমে বললো, "ভেবেছিলাম পুজোয় তোদের নিয়ে হৈ চৈ করবো, নাটক নামাবো। তা যা নাটক চলছে এখানে, পুজো টুজো সব মাথায় উঠেছে লোকের ----।"

পাশের ঘর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে আওয়াজ এলো, "কে রে নীতু?"

"এই যে আমি জ্যেঠু।" তারপর বন্ধুদের উদ্দেশে নীচু গলায় বললো, "বিপদ কখনও একা আসে না। মাস চারেক আগে হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে জ্যেঠুর কোমর থেকে পায়ের পাতা অবধি প্যারালিসিস্ হয়ে গেছে। কাশীতে গুরুদেবের কাছে গেছিলেন, সেখানে থাকাকালে ঘটলো ব্যাপারটা। ওখানেই ডাক্তার টাক্তার দেখিয়েছেন। তারপর কোনমতে স্ট্রেচারে শুয়ে দেশে ফিরেছেন। অথচ আমায় একটিবারও জানাননি পাছে আমার ফাইনাল পরীক্ষা খারাপ হয়ে যায় ----।"

ওরা তিনজন পাশের ঘরে ঢুকলো। কারুকার্য করা পালঙ্কে গলা অবধি চাদর ঢাকা দিয়ে নীতীশের জ্যেঠামশাই শুয়ে আছেন। হাতের কাছে একটা গোল টেবিলের উপর রেকাবিতে কিছু ফল ও এক গ্লাস দুধ রয়েছে। ভৃত্য হরিহর একপাশে দাঁড়িয়ে হাতপাখা নাড়ছে।

জ্যেঠামশাই বললেন, "এই যে বাবারা এসো।" তারপর হরিহরের দিকে চেয়ে বললেন, "ছেলেদু'টো ট্রেন থেকে নেমেছে, ফল মিষ্টি যাহোক কিছু দে। তারপর রান্নাবান্নার জোগাড় দেখ। ---- নারায়ণ ---- নারায়ণ ---- নারায়ণ।"

শৈলেন ও সুজন ওঁর পায়ের ধুলো নিলো। গতবার ওরা যখন এসেছিলো, নীতীশের জ্যেঠামশাই শম্ভুনাথবাবু ওদের সঙ্গে করে ঘুরে ঘুরে স্থানীয় দ্রষ্টব্য যা কিছু ---- তা সে যত অকিঞ্চিৎকর হোক ---- দেখিয়েছিলেন। আজ সেই মানুষটির এই অসহায় অবস্থা দেখে ওদের মন হু-হু করে উঠলো।

শম্ভুনাথ বোধহয় সেটা বুঝলেন, বললেন, "নিজের জন্যে ভাবিনা। শরীরং ব্যাধি মন্দিরং। শরীর থাকলে রোগ জরা কখনো না কখনো আসবেই। কিন্তু চণ্ডীপুরে আজকাল কি সব ভয়ানক ঘটনা ঘটছে শুনেছ? চার চারটে সুস্থ সমর্থ মানুষকে বাঘে মারলো। বিশ্বাস করতে পারো? অথচ কর্তাদের টনক নড়ছে না। ভুলিয়ে ভালিয়ে ভোটটা কোনমতে আদায় করতে পারলেই তাদের প্রয়োজন মিটে গেল।

তারপর মানুষগুলোকে বাঘে খাক, কুমিরে খাক, অথবা তারা স্রেফ না খেয়ে মরুক, তাদের তো তাতে কচু।" শম্ভুনাথ কম্পিত হাতে চোখের কোণ মুছলেন।

নীতীশ চণ্ডীপুরের ভয়াবহ দুর্যোগের কাহিনী শোনালো। দাসেদের ছোট ছেলে রমেন। ছেলেটা জন্মাবধি একটু হাবা ধরনের। কাজকর্ম করতে পারে না। অন্যান্য ভাইরা জমিজিরেত দেখে, বিয়ে থাওয়া করেছে। তাদের বউরাই ওকে দু'বেলা চাট্টি খেতে দেয়। বাকী সময়টা রমেন আনমনে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। একদিন রাতে সে আর বাড়ি ফিরলো না। পরদিন ধানের ক্ষেতে তার দেহটা পাওয়া গেল। গলা থেতলে গেছে, শরীরের কয়েক জায়গা খাবলানো। আশে পাশে বাঘের পায়ের ছাপ ----।

"বাঘের ডাক শোনেনি কেউ?"

"এর আগে দু'দিন গভীর রাত্রে একটা অদ্ভুত আওয়াজ শোনা গেছিল। গাঁয়ের লোক তখন অধিকাংশই ঘুমে অচেতন। যারা জেগেছিল এবং যাদের সেই বিকট আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল, তাদের কেউই শব্দটা শনাক্ত করতে পারলো না। কেউ ভাবলো পাশের গাঁ থেকে ষাঁড় এসেছে, কেউ ভাবলো গোভূত। ওটা যে বাঘের গর্জন সে কথা স্বপ্নেও ভাবেনি কেউ।"

শৈলেন বললো, "কিন্তু বাঘ আসবে কোত্থেকে, এখানে জঙ্গল কোথায়?"

শম্ভুনাথ বললেন, "সেটাই তো প্রশ্ন। এক যদি গেল বছর বন্যার সময় যখন শহরগুলো ভেসে যাচ্ছিল তখন কোনও চিড়িয়াখানা থেকে পালিয়ে এসে থাকে। হয়তো এ্যাদ্দিন গা ঢাকা দিয়ে ছিল কোথাও।"

"কিন্তু চিড়িখানার বাঘ খোয়া গেলে তো লোকে জানতে পারতো। কই তেমন কিছু কাগজে পড়িনি তো !"

শম্ভুনাথ তিক্ত কণ্ঠে বললেন, "দেশে যে কত অঘটন ঘটছে, কত জিনিস দিনের আলোয় পাচার হয়ে যাচ্ছে তার ক'টা খবরই বা কাগজে ছাপে? যে খবরগুলো প্রকাশ হয়ে পড়লে কর্তাদের অসুবিধা ঘটতে পারে সে খবরগুলো কাগজে বেরোয় ভেবেছো? স্রেফ চাপা দেওয়া হয় তাদের ----।"

সুজন বললো, "তা বটে। তাছাড়া চাকরি যাওয়ার ভয়ে চিড়িয়াখানার লোকেরাই হয়তো চেপে গেছে ব্যাপারটা। কিছু একটা গোঁজামিল দিয়ে হিসেব মিলিয়েছে।"

শৈলেন বলে, "চুপ কর। বাঘ বলে কথা। বাঘের চামড়া জড়িয়ে কাউকে বাঘ সাজিয়ে খাঁচায় পুরেছে বলতে চাস?" কথাটা বলেই অপ্রস্তুত মুখে থেমে গেল শৈলেন। ওর খেয়াল হ'ল ঠাট্টা-তামাশার পরিবেশ এটা নয়।

হরিহর ট্রে-তে দু'টো প্লেট নিয়ে সামনে দাঁড়ালো। প্লেটে সন্দেশ, নারকোলের নাড়ু ও দুটো করে পাকা কলা। শৈলেন ও সুজনের হাতে প্লেট দু'টো দিয়ে নীতীশকে বললো, "তোমার জলখাবার আনি দাদাবাবু?"

নীতীশকে নিরুত্তর দেখে শম্ভুনাথ বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিয়ে আয়। জিজ্ঞেস করার কি আছে? একটু চা করবি তার পর।"

নীতীশ অন্যমনস্কভাবে কি যেন চিন্তা করছে। কপালের মাঝখানে সূক্ষ্ম রেখা ফুটে উঠেছে, ঠোঁট দু'টো ইষৎ চাপা। সবাইকে ওর দিকে তাকাতে দেখে হঠাৎ আত্মসচেতন হয়ে উঠলো সে।

সেটা ঢাকার জন্যেই শৈলেনকে প্রশ্ন করলো, "সুবল - নিমাই - পঙ্কজ, ওরা এলো না?"

"ওরা কলকাতায় নেই এখন। সুবলের দাদার বিয়েতে বরযাত্রি গেছে। রাঁচি। আসছে হপ্তায় এখানে আসার কথা ছিল। তোর পাঠানো টেলিগ্রামটা পেলে বোধহয় আর আসবে না।"

শম্ভুনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "কোথা থেকে কি হয়ে গেল। পুজো, পুজো, কত তার তোড়জোড়। নীতু সেই কবে থেকে লাফাচ্ছে। এর মধ্যে এই কাণ্ড !"

সুজন কেশে গলা সাফ করে বললো, "কাল কখনকার ঘটনা এটা?"

শম্ভুনাথ বললেন, "একেবারে ভরসন্ধ্যে। গাঁয়ে পরপর তিনটে অপমৃত্যু ঘটে গেছে, ভাবলাম পুরুতমশাইকে ডেকে একটু শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করা উচিত। পাঁচজনের কার কি মত জেনে নিয়ে একটা যজ্ঞি টজ্ঞি কিছু আয়োজন করবো। আমার অবস্থা তো দেখছো।

ভগবান মেরে রেখেছেন। উঠে বসার ক্ষমতাটুকুও নেই আর। কালীচরণকে দিয়ে পণ্ডিতমশাই আর গাঁয়ের মাতব্বর ক'জনকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। শুধু গাঙ্গুলীমশাই আর কুণ্ডুমশাই বাকী ছিলেন। সেই দু'বাড়িতে বলতেই বেরিয়েছিল সে। তা প্রাণটুকু নিয়ে আর ফিরতে পারলো না।"

শম্ভুনাথের দু'চোখ জলে ভরে এলো।

"তোমরা এসে পড়ায় একপক্ষে ভালই হ'ল। নীতুটা একেবারে ভেঙে পড়েছে। ছোটবেলা থেকে কালীচরণকে দেখে এসেছে। তার যত্ন আত্তি পেয়েছে। বাড়িতে মেয়েমানুষ বলতে তো কেউ নেই। আর বিষয় সম্পত্তির ঝামেলা নিয়ে আমার অবস্থা তো সেই যে বলে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল - ঠিক তাই। নীতুর দেখাশোনা বলতে গেলে কালীচরণই করেছে ----। আটদিন আগে ঘোষেদের বলাইকে যখন বাঘে নিলো তখন আমিই নীতুকে বলেছিলাম, বাবা এর মধ্যে আর ছেলেগুলোকে আসতে বলিস নে। আমাদের তো ভিটে কামড়ে পড়ে থাকতেই হ'বে। ওদের আর বিপদের মধ্যে টেনে আনা কেন। নীতু দোটানার মধ্যে ছিল। সেদিন তোমাদের তার পেয়ে মনস্থির করে তখুনি কালীচরণকে লালগঞ্জের পোস্টঅফিসে পাঠালো। তারপর কাল আবার এই কাণ্ড।"

সুজন বললো, "রমেন, বলাই, কালীচরণ - তিনজন হ'ল। আর একজন কে?"

"সে অবশ্য এ গাঁয়ের লোক নয়। তারিণী শহরে থাকতো। পোদ্দারের মামাশ্বশুর। জামাইবাড়ি এসেছিল ক'দিনের জন্যে। চণ্ডীপুরে এলে নাকি ওর হাঁপানির আরাম হয়। তা জন্মের মত আরাম হ'ল একেবারে।"

শৈলেন বললো, "এ ছাড়া গরু-বাছুর এ সবও নিশ্চয়ই বাঘের পেটে গেছে কিছু কিছু?"

নীতীশ বললো, "সেটাই আশ্চর্য ! সাধারণত অন্যান্য জীবজন্তুর উপরেই প্রথম হামলাগুলো হয়। তারপর ক্রমে ক্রমে পদোন্নতি হয়ে নরখাদকের পর্যায়ে ওঠে বাঘ। তাও সব ক্ষেত্রে নয়। কিন্তু এ বাঘটার প্রথম থেকেই মানুষের উপর নজর।"

শম্ভুনাথ বললেন, "তুমি বলছো সেই আগেকার দিনের কথা যখন গ্রামে গ্রামে গোয়াল ভরা নধর গরু-বাছুর থাকতো। এখনকার গরু তো

শুধু হাড় আর চামড়া।"

শৈলেন বললো, "আর একটা কারণও হতে পারে। সত্যিই যদি চিড়িয়াখানার বাঘ হয় তবে মানুষ সম্বন্ধে প্রাথমিক ভয় বা চক্ষুলজ্জা কেটে গেছে। এরকম বাঘের পক্ষে মানুষকে আক্রমণ করা স্বাভাবিক।"

নীতীশের মুখে আবার খানিক আগের ভাব ফুটে উঠলো। কি যেন মনে করার চেষ্টা করছে সে।

শৈলেন ওর মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে শম্ভুনাথের দিকে চেয়ে বললো, "জ্যেঠামশাই, আপনার নিশ্চয়ই আরও আফসোস এই জন্যে যে আপনি একজন অত বড় শিকারী ছিলেন। আপনার বার্মার জঙ্গলে শিকারের গল্প কতবার শুনেছি। আজ আপনি সুস্থ থাকলে গ্রামের লোকেদের এ অবস্থা হত না।"

শম্ভুনাথ নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

সুজন বললো, "গেলবার অনেক ট্রফি দেখে গেছি। ভালুকের চামড়া, হরিণের মাথা ---- সেগুলো দেখছি না তো?"

শম্ভুনাথ বললেন, "কাশী থেকে ফিরে আসার পর হরিহর আমার কথামত ওগুলো কাঠের বাক্সে পুরে গুদোমঘরে রেখে এসেছে। ওগুলো দেখলেই পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে যায় আর নিজের এ অবস্থা আরও অসহ্য লাগে। এ বরং ভেবে নেবো যে আজীবন এমনি পঙ্গু হয়েই কেটেছে ----।"

হরিহর মালিশের শিশি হাতে পালঙ্কের কাছে এসে দাঁড়ালো। ততক্ষণে ওদের চা খাওয়া হয়ে গেছে। তিন বন্ধু পাশের ঘরে চলে এলো।

শৈলেন বললো, "হরিহরকে গেলবার দেখিনি তো?"

"কাশী থেকে নিয়ে এসেছেন জ্যেঠু। দারুণ কাজের। কথা বলে কম, সারাদিন ঘড়ির কাঁটার মত কাজ করে যায়।"

এরপর ক'টা দিন কাটলো একেবারে বৈচিত্রহীনভাবে। সুজন হাঁপিয়ে উঠেছে। গ্রামে সিনেমা - টিভি - জিমখানা না থাকুক অন্তত খোলা আকাশ, সুঘ্রাণ বাতাস, মাছধরা, সাঁতার, বনভোজনের আকর্ষণ তো থাকবে ! সর্বক্ষণ যদি ঘরে দরজা জানলা এঁটে গুম্‌সেই মরতে হ'বে তাহ'লে আর কষ্ট করে গ্রামে আসা কেন? কলকাতা বেঁচে থাক। সুজন

বার কয় গাঁই গুঁই করেছে এ নিয়ে, কিন্তু ওর কথা গা করছেনা ওরা, অর্থাৎ শৈলেন ও নীতীশ।

নীতীশ পড়াশোনা শেষ করে এবার স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রামে এসেছে। ওর বাবা জমিজমা প্রচুর রেখে গেছেন। সেই আয়ে আরামে কাটিয়ে দিতে পারে সারা জীবন, কলকাতায় বসেও। কিন্তু নীতীশের চিন্তাধারা আলাদা। নীতীশ গ্রামবাসীদের উন্নতি চায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ-বাস করে চাষা-ভুষোদের সামনে এক জাজ্বল্যমান উদাহরণরূপে প্রতিষ্ঠিত করবে নিজেকে এবং তার সাফল্যের আলো গ্রামের দুঃস্থ মানুষকে এক নতুন স্বাস্থে-সম্পদে ভরপুর জগতের পথ দেখাবে। বাঘের হিড়িকে সাময়িকভাবে দমে গেলেও সদুদ্দেশগুলো পাল্টায়নি তার। আর শৈলেনের কথা হ'ল এসে যখন পড়েইছে এবং হাতে একমাসের ছুটি যখন তাদের আছে তখন বাঘের ভয়ে পিঠটান না দিয়ে বিপদের দিনে বিপন্ন মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানো ঢের বেশি শ্রেয়। তাছাড়া কলকাতায় ফিরে গিয়ে এখন আর নাটক নামানোর টাইম নেই, সুযোগও পাবে না। সেখানে পাড়ার লোকেরা ওদের মুখ চেয়ে বসে নেই কেউ। পুজোর প্রোগ্রাম টোগ্রাম ছাপতে চলে গেছে এ্যাদ্দিনে। অতএব বর্তমান অবস্থাটা মেনে নেওয়াই সমীচীন ----।

অবশ্য তা'বলে ওরা একেবারেই যে বাড়ির বার হয় না তা নয়। দিনের বেলা রোজই কিছুটা সময় এখানে ওখানে কাটিয়ে আসে। শম্ভুনাথ গোড়ার দিকে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। হরিহরকে সঙ্গে পাঠাতে চেয়েছিলেন দেহরক্ষী হিসাবে। কিন্তু হরিহরকে নিয়ে বেড়াতে বেরোলে ফিরে এসে আর আহার জুটবে না কারো। দুলু নামে নতুন যে চাকরটি বহাল হয়েছে তার দ্বারা কাজের চেয়ে অকাজই হয় বেশি। ছেলেটির বয়স বছর বারোর বেশি নয়। অপুষ্টির জন্যে দেখায় আরও কম। ভীষণ ছট্‌ফটে। মনে হয় ওর শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন আলাদা প্রাণকেন্দ্র দ্বারা চালিত হ'চ্ছে, সম্পূর্ণ সমন্বয়হীনভাবে। ফলে দুলু যেখানে, ছোটখাটো এবং মাঝারি মাপের অঘটনের ছড়াছড়ি সেখানে। বড় কোনও দুর্ঘটনা যাতে না ঘটতে পারে তারই সাবধানতা হিসাবে রান্নাবান্না ইত্যাদি সম্ভাব্য বিপদজনক কার্যকলাপ থেকে যথাসম্ভব দূরে রাখা হয় তাকে।

ওরা তিনজনে গ্রামটা ভাল করে ঘুরে দেখেছে। বাঘ লুকিয়ে থাকতে পারে এমন কোনও জায়গা চোখে পড়েনি। অবশ্য বুদ্ধিমান বাঘ হ'লে দিনের বেলা গ্রামে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করবে না। এ বাঘটা হয়তো দূরে কোথাও মাঠে ঘাটে কি নির্জন রেললাইনের ধারে ঘোরাফেরা করে। রাত্তির হ'লে শিকারের সন্ধানে মানুষের এলাকায় ঢোকে।

ওরা আসার পরের শনিবার রাত্রে বাঘের ডাক শুনতে পেলো। পর পর তিনবার। তারপর আর শোনা গেল না। শৈলেন আর সুজন দু'জনেই শুনলো সে ডাক।

অনেকক্ষণ কান খাড়া করে থাকার পর শৈলেন ডাকলো, "সুজন, এই সুজন, শুন্‌ছিস্?"

সুজন গায়ের চাদর সরিয়ে বিছানার উপর উঠে বসলো।

"চল নীতীশকে ডাকি।"

ঠিক সেই সময় লণ্ঠন হাতে নীতীশ ঢুকলো। চুল উসকো খুসকো, দু'চোখে উদ্বেগ।

"নির্ঘাত আজ আর একজনের ঘাড় মট্‌কালো ----।"

বাইরে আঙুল দেখিয়ে শৈলেন বললো, "ওই দিক থেকে এলো আওয়াজটা। পুকুর ঘাটের পিছন দিকে আমগাছটা যেখানে। তবে মানুষের আওয়াজ পাওয়া যায়নি।"

নীতীশ বললো, "পাওয়া যায় না। রমেন, বলাই, তারিণী, কালীচরণ কেউ টুঁ শব্দটি করেনি। অন্তত কারো কানে আসেনি। এক লাফে টুঁটি কামড়ে ধরে, আওয়াজ বেরুবে কোথা থেকে?"

শৈলেন চারিদিকে তাকিয়ে বললো, "বাইরে গিয়ে একটু দেখে এলে হ'ত।"

নীতীশ বললো, "না রে, সেটা ঠিক হ'বে না। বাঘটা এখনও কাছে পিঠেই আছে হয়তো। অনেক লোকজন থাকলে মশাল টশাল নিয়ে বেরুনো চলে। এই রাতদুপুরে কেউ রাজী হ'বে না বেরুতে। তাছাড়া তাদের ডাকতেই বা যাবে কে?"

সুজন বললো, "ইস কি সাংঘাতিক অবস্থা। ভরা লোকালয়ে বাঘ

খুশি মত মানুষ মেরে বেড়াচ্ছে অথচ প্রতিকারের উপায়টুকু পর্যন্ত নেই।"

"কাল লালগঞ্জ থানায় ঘুরে আসবো ভাবছি। পুলিসের উচিত একটা কিছু ব্যবস্থা করা।"

সুজন সায় দিল, "হ্যাঁ। সাধারণত বনবিভাগের লোক এ সব ব্যাপার নিয়ে ভীল্ করে। এখানে তো ত্রিসীমানার মধ্যে বনের ছিটেফোঁটাও নেই। এখানে যত অপঘাত অপমৃত্যু সব পুলিসের আওতায় পড়া উচিত।"

নীতীশ হতাশ গলায় বলে, "গিয়ে দেখতে পারিস, তবে ফল হ'বে না কিছু। জ্যেঠু অনেকবার লোক পাঠিয়েছে, ওরা আসেনি।"

শৈলেন বললো, "দেখা যাক। নতুন দারোগা আসায় ওদের মনোভাবের যদি কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকে।" তারপর প্রশ্ন করলো, "জ্যেঠামশাই কি ঘুমোচ্ছেন?"

নীতীশ বললো, "হ্যাঁ। ঘুম আসে না বলে রাত্রে প্রায় দিনই কাম্পোজ খেয়ে ঘুমোন।"

"ওঁর কাছে কেউ থাকে না? রাত্রে যদি ডাকেন টাকেন?"

"হরিহর ও ঘরে মাটিতে বিছানা পেতে শোয়।"

সুজন বললো, "আজ আর আমার ঘুম আসবে না। এক কাপ চা পেলে মন্দ হ'ত না।"

নীতীশ বললো, "দাঁড়া হরিহরকে ডাকি।" একটু পরে ফিরে এসে বললো, "না রে। দরজা বন্ধ। দু'একবার দরজায় ধাক্কা দিলাম, হরিহরের ঘুম ভাঙ্লো না। সারাদিনের খাটুনির পর মড়ার মত ঘুমোচ্ছে। বেশি ডাকাডাকি করলে আবার জ্যেঠু জেগে যেতে পারেন।"

সদর দরজায় একটা আওয়াজ হ'ল। ওরা তিনজনে চমকে উঠলো। এ তো দুলুর গলা !

"দাদাবাবু! হরিহর! শীগ্গীর দরজা খোলো। ও দাদাবাবু!"

শৈলেন তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিলো। দুলুর সর্বাঙ্গ ধুলো কাদায় মাখামাখি হয়ে এক কিম্ভুত চেহারা হয়েছে তার। পরনের জামাকাপড় ছিঁড়ে গেছে। হাঁটু ছড়ে রক্ত বেরোচ্ছে। দু'চোখে উদ্ভ্রান্ত চাউনি। একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো সবাই। দুলু শুধু থর থর করে কাঁপতে লাগলো সেইখানে দাঁড়িয়ে।

শৈলেন বললো, "পরে সব কথা শুনবো। আয় আগে ওষুধ লাগিয়ে দিই।" দুলুর হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে অন্য ঘরে নিয়ে গেল।

একটু পরে হরিহর ওদের দেখে বললো, "দাদাবাবু, ঘুমোওনি তোমরা?" তারপর ওদের মুখ থেকে সব শুনে আতঙ্কভরা চোখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো।

শৈলেনকে একা ফিরে আসতে দেখে ওরা প্রশ্ন করলো, "দুলু কই?"

শৈলেন বললো, "ওকে শুইয়ে এলাম। নার্ভাস শকে ভুগছে। সকালে ঠিক হয়ে যাবে।"

সুজন বললো, "ওকে কি বাঘে ধরেছিল?"

শৈলেন বললো, "ধ্যুস্ ! তাহলে আর জ্যান্ত ফিরতে হ'ত না। ও যা বললো তা যদি বিশ্বাস করতে হয় তবে ওকে ধরেছিল ভূতে। নিশি ভূতে। ঘুমের ঘোরে নাকি শুনলো ওর নাম ধরে কে ডাকছে। কখন কোন দরজা দিয়ে বেরিয়েছে কিচ্ছু মনে নেই। বলছে চণ্ডীমণ্ডপের পাশ দিয়ে যেতে যেতে জ্ঞান হ'ল। দেখে ওর ঠিক সামনে লালপাড় শাড়ি পরে একগলা ঘোমটা টেনে কে যাচ্ছে। ও থামতেই শাড়ির মধ্য থেকে একটা হাত বের হয়ে এসে ইশারায় ওকে ডাকলো। সে হাত মানুষের নয়। কঙ্কালের।"

সুজন বললো, "রাবিশ।"

শৈলেন বললো, "আমাদের কাছে রাবিশ হতে পারে, এদের কাছে নয়। যুগ যুগান্তের সংস্কার মনের মাঝে, চোখেও তাই দেখে।"

হরিহর কম্পিত গলায় বললো, "চণ্ডীমণ্ডপের কাছে বলেই ওর কোন ক্ষতি করেনি, নইলে ঘাড় ভেঙে রেখে দিতো।"

নীতীশ চমকে উঠে বললো, "ঘাড় ভাঙার কথায় মনে পড়লো। বাঘটা যখন ডাকছিল, দুলু তো বাইরেই ছিল। ইস্ আর একটু হলে শেষ হয়ে যেতো।"

শৈলেন হাত নেড়ে বললো, "তা ঠিক। তবে ভাগ্যক্রমে বাঘের ডাক যেদিক থেকে আসছিল, চণ্ডীমণ্ডপ তার একেবারে উল্টো দিকে, গ্রামের অন্যপ্রান্তে। চারিপাশে এত মানুষ গিজ গিজ করছে, তার মধ্যে আলাদা করে ওর গন্ধ বাঘের নাকে পৌঁছয়নি।"

সুজন বললো, "যাই বলো, আমাদের দুলুর নবজন্ম লাভ হ'ল

আজ।"

পরদিন সকালে শৈলেন গরুরগাড়িতে চেপে লালগঞ্জ গেল। দুলুকেও নিয়ে গেল।

বললো, "ওকে একটা অ্যাণ্টিটিটেনাস্ ইঞ্জেকশন্ দিইয়ে আনবো। সারা গায়ে অত কেটে ছড়ে গেছে। ধুলো - মাটি - গোবর কত কি লেগেছে তাতে।"

যাবার আগে সুজনকে একান্তে ডেকে অনেক উপদেশ নির্দেশ দিয়ে গেল। ফিরলো সন্ধ্যার একটু আগে। ওরা রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েছে ততক্ষণে। বিশেষ করে শম্ভুনাথ বারে বারে খোঁজ নিচ্ছেন আর নিজের মনে নানান মন্তব্য করছেন আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের হঠকারিতা সম্বন্ধে। নীতীশও বেশ ঘাবড়ে যাচ্ছিল। কাল রাতে বাঘটা যে ফাঁকা আওয়াজ করেই ফিরে গেছে, কারও প্রাণহানি ঘটেনি, সেই সাময়িক সৌভাগ্যটুকু বিধাতা না আজ সুদে আসলে উশুল করে নেন সেই আশঙ্কায় কাঁটা হচ্ছিল মনে মনে।

হরিহর যখন খবর দিলো যে ওরা ফিরেছে, শোরগোল পড়ে গেল বাড়িতে। কিন্তু দুলু কই? শৈলেন বললো ওকে হাসপাতালে ভর্তি করে এসেছে। ওখানে যেয়ে দুলু নাকি দারুণভাবে ভেঙে পড়ে। ডাক্তার বলেছে ডিলেইড্ শকে ভুগছে, বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়লে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে এতে।

হরিহরকে ডেকে বললো, "হরিহর, এক গ্লাস জল খাওয়াও দিকি।"

হরিহর জল আনলো।

শৈলেন বলে চললো, "বুঝলি নীতীশ, আমি ঠিক বলেছিলাম। নতুন দারোগা খুবই হেল্প্ফুল। বললো আজই হেডকোয়ার্টারে এই নরখাদক বাঘের কথা জানিয়ে চিঠি দেবে যাতে তারা গ্রামে একজন ভাল শিকারী পাঠাবার ব্যবস্থা করে। এক কথায় এই রিভলবারটা দিয়ে দিলো আমায়। বললো বাইরে বেরুলে যেন সর্বদা এটা সঙ্গে রাখি। অন্য সময় এটা বাক্সে তালাবন্ধ থাকবে। অবশ্য রিভল্ভার্ দিয়ে বাঘ শিকার মুস্কিল, তবে নেহাত যদি কাছাকাছি এসে পড়ে ----।"

শম্ভুনাথের ঘরে গিয়ে খানিকক্ষণ বসলো ওরা। থানার দারোগা যা বলেছে জানালো।

খাওয়াদাওয়া করে শুতে যাবার একটু আগে সুজন বললো, "নীতীশ শোন, আমার সেই পুরোনো ট্রাবল্‌টা আবার শুরু হয়েছে। বলেছিলাম না, সেবার কোন্নগরে গিয়ে হয়েছিল? কেমন একটা দম বন্ধ দম বন্ধ ভাব, বুকের উপর যেন ভারি কিছু চেপে রয়েছে।"

নীতীশ বললো, "সকালে শৈলেনের সঙ্গে লালগঞ্জ গেলে ডাক্তার দেখিয়ে আসতে পারতিস।"

সুজন বললো, "এমন কিছু বাড়াবাড়ি হয়নি এখনও। তাছাড়া গতবার ডাক্তার বলেছিল স্রেফ অ্যালার্জি, কোনও ওষুধ নেই এর। হয় নিজে নিজে সেরে যাবে নয় হাঁপানিতে দাঁড়াবে ক্রমে। সে যাক গিয়ে। বলছিলাম কি, তোর ঘরটায় দু'দিকে জানলা। ও ঘরে শুলে হয়তো অত গুম্‌সো লাগতো না।"

নীতীশ বললো, "তুই তবে আমার ঘরে শো। আমি আর শৈলেন এ ঘরে শোবো।"

প্রতিবছর চণ্ডীমণ্ডপে ধুমধাম করে পুজো হয়। অষ্টমীর দিন গ্রামসুদ্ধ লোক পাত পেড়ে ভোগপ্রসাদ খায়। আবাল - বৃদ্ধ - বনিতা কেউ বাদ যায় না। পুজোর চারদিন চণ্ডীমণ্ডপ মানুষের ভিড়ে জমজমাট হয়ে থাকে সর্বক্ষণ। এবার সে সব কিছুই নেই। নেহাত নিয়মরক্ষার জন্য পুজো করা। পুজোটা হচ্ছে নীতীশদের পশ্চিমের হলঘরটায়, খোলামেলা চণ্ডীমণ্ডপের তুলনায় অনেক বেশি নিরাপদ বলে। লোকজন যারা আসছে তাদের মুখে ভয়াল বাঘেরই চর্চা শোনা যাচ্ছে কেবল। সারা গ্রামে এই একটাই পুজো, তাও কোনমতে নমো নমো করে সারা হল। দশমীর দিন গ্রামের বাইরে বড় দীঘিতে প্রতিমা বিসর্জন হবে। নীতীশ, শৈলেন ও সুজনও গেল দলের সঙ্গে। শম্ভুনাথ পই পই করে বলে দিয়েছিলেন বেলা থাকতে যেন প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে গ্রামে ফিরে আসে সবাই। তবু এতগুলো ছেলে ছোকরার ভিড়ে একটু দেরীই হয়ে গেল। পুজোতে এতটুকু উৎসব আনন্দ হয়নি, দেবীর বিদায়কালে দীঘির জলে মাতামাতি করে যেটুকু পুষিয়ে নিতে পারে ! শেষমেশ প্রতিমা ভাসিয়ে যখন ফিরছে তখন সন্ধ্যার দেরী নেই আর। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে কাছে কাছে হাঁটছে সবাই। কেমন গা ছম্ ছম্ করছে । বাঘের দৌরাত্ম্য শুরু হবার পর এতক্ষণ পর্যন্ত বাইরে থাকে না কোনদিন, এর অনেক আগেই কুড়েঘর

হোক, কোঠাবাড়ি হোক যে যার ঘরে ফিরে দরজায় আগল টেনে দেয়। বোধহয় সেই কথা স্মরণ করেই হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেছে সবাই। খানিক আগের শোরগোল থেমে গেছে।

হঠাৎ কুণ্ডুমশাইয়ের ছেলে কানাই হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠে তার পাশের লোকটাকে জাপটে ধরলো। ততক্ষণে অন্যদেরও চোখে পড়েছে জিনিসটা। চৌধুরীদের গোয়ালঘরের মাটির দেয়াল ঘেঁষে বনতুলসীর ঝোপ। ঝোপের ফাঁকে একটা লেজ নড়ছে। ভাল করে ঠাহর করে দেখার আগেই লেজটা হলদে ডোরাকাটা একটা ঝলক সমেত গোয়ালঘরের পিছনে মিলিয়ে গেল। চৌধুরীমশাই ডুকরে কেঁদে উঠলেন। বাকিরা মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে রইলো। কারো মুখে কথা নেই। শেষে শৈলেন বুদ্ধি দিলো, সবাই মিলে চেঁচানো যাক, তাহলে বাঘ ভয় পাবে। ওরা তবু চুপ।

শৈলেন পকেট থেকে রিভলবার বার করে বললো, "ভয় নেই। এতগুলো লোকের সামনে বাঘ এগুবে না। সবাই আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলো - দুর্গামাতা কি জয় !"

আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে সমবেত প্রতিধ্বনি উঠলো - দুর্গামাতা কি জয়। জয়ধ্বনি করতে করতে গুটি গুটি এগোতে লাগলো ওরা। গোয়ালঘরের পাশে এসে থামলো। ভিড়ের ভিতর থেকে চৌধুরীমশাই আর্তকণ্ঠে ডাক পাড়লেন, "ওরে আমার লালি, লালিরে !"

গোয়ালঘরে কিছু নড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল আর সঙ্গে সঙ্গে 'বাপ্ রে!' বলে কয়েক পা পিছিয়ে এলো সবাই। বাঘের ভয়ে গোয়ালঘরের দেয়ালের উপরকার খোলা জায়গাটা কিছুদিন আগে দরমা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। ভিতর অবধি নজর যায় না তাই। শুধু আওয়াজ শোনা যাচ্ছে - সপাৎ সপাৎ। বাঘমশাই যে মহা পরিতোষে চৌধুরীদের গাভীন গাইটাকে নিঃশেষে চেটেপুটে খাচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রইলো না আর। আতঙ্কে কণ্টকিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। জোরে নিঃশ্বাস নেবার সাহসটুকু পর্যন্ত নেই যেন। কতক্ষণ এভাবে কেটেছে খেয়াল নেই কারো। হঠাৎ শৈলেনের গলা পেয়ে চমক ভাঙলো ওদের।

গোয়ালঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে শৈলেন ডাকছে, "এই যে এদিকে। দেখে যাও সবাই।"

ও যে কখন দল ছেড়ে ওদিকে গেছে লক্ষ্য করেনি কেউ। সবাই হুড়মুড় করে এগিয়ে গেল। অবাক হয়ে দেখলো লালি একমনে জাব খেয়ে চলেছে সপাৎ সপাৎ করে। ওদের সাড়া পেয়ে কালো গভীর দু'চোখ তুলে তাকালো। চৌধুরীমশাই লালির পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে কেঁদে ফেললেন।

নীতীশরা বাড়ি ফিরে দেখলো শম্ভুনাথ উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করছেন। ওদের কাণ্ডকারখানায় বেশ মনক্ষুন্নও হয়েছেন উনি।

বললেন, "বাবা নীতু, আমার বয়স হয়েছে, আগের মত আর মনের বল নেই। দশ বছর আগে যেদিন খবর পেলাম তোমার বাবা-মাকে রাক্ষসী পদ্মা গ্রাস করেছে, সেদিন থেকে মনটা যেন সর্বদা ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে - এই বুঝি বংশের শেষ বাতিটুকুও নিভে যায়। লোকে বলতেই বলে, সাবধানের মার নেই। দেখছো তো গ্রামে কি রকম একটার পর একটা অঘটন ঘটে চলেছে। এ তো আর গল্প-কথা নয়, সাক্ষাৎ যমরাজ এসে নেমেছেন চণ্ডীপুরে। এর উপর তোমরাও যদি এমন অবুঝ হও কতদিন আর বিপদ ঠেকিয়ে রাখবো ----।"

শম্ভুনাথের গলা বুঁজে এলো। হাতের তেলোয় চোখ মুছলেন উনি। শৈলেন, সুজন ও নীতীশ অপরাধী মুখে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

তারপর শৈলেন ওঁর বিছানার কাছে এসে আপোষের সুরে বললো, "জ্যেঠামশাই, আজ বিজয়া দশমী। আপনাকে কথা দিচ্ছি আর গোঁয়ার্তুমি করবো না আমরা। আপনি আমাদের প্রসন্নমনে আশীর্বাদ করুন।"

নীচু হয়ে চাদরের তলায় হাত দিয়ে শম্ভুনাথকে প্রণাম করলো। ক্ষণেকের জন্যে শম্ভুনাথের মুখ যন্ত্রনায় বিকৃত হয়ে উঠলো।

অস্ফুট স্বরে বললেন, "উঃ !"

তারপর কয়েক মুহূর্ত চোখ বুঁজে রইলেন।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে আত্মগতভাবে বললেন, "আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। মা, মাগো! এ বছর আর তোর পুজোয় কোন সমারোহই করতে পারলাম না মা!"

পরদিন সকালে আবার লালগঞ্জ পাড়ি দিল শৈলেন। সেখানে

ডাক্তার ও পুলিস ছাড়াও আর একটা আকর্ষণ খুঁজে পেয়েছে সে। মাঝারি গোছের একটা লাইব্রেরী। লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ ডাক্তারের রোগীগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং তারই সুপারিশে প্রতিবার আধ ডজন খানেক করে বই নিয়ে আসে শৈলেন। অবশ্য রসগ্রাহী সে একাই নয়।

সেদিন লালগঞ্জ থেকে দিনে দিনেই ফিরলো শৈলেন। বোধহয় শম্ভুনাথকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি স্মরণ করেই। সঙ্গে দুলু। হাসপাতালের ওষুধপত্রের গুণে কিংবা লালগঞ্জের আবহাওয়ার প্রভাবে কে জানে এ ক'দিনে দুলুর বেশ পরিবর্তন হয়েছে দেখা গেল। কথাবার্তা বিশেষ বলে না, কেমন একটা আত্মসমাহিতভাব। অবশ্য পরিবর্তনটা যে একেবারে পুরোপুরি নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেল খানিক পরেই যখন শাদা পাথরের বিরাট গ্লাসভর্তি শরবৎ শম্ভুনাথের হাতে দিতে যেয়ে আচমকা ওর কোলের উপর ফেলে দিলো। নীতীশ, সুজন ও শৈলেন বকে রসাতল করলো ওকে। মারধোরটা বাকি রইলো নেহাত শম্ভুনাথের খাতিরে। কারণ সেইক্ষণে তাঁর পোশাক আশাক বিছানার চাদর পালটে দেওয়াই বেশি দরকার ছিল, দুলুকে ধোলাই দেওয়ার চেয়ে।

শৈলেন রাগত গলায় বললো, "যা, হরিহরকে পাঠিয়ে দে। ওদিকের কাজকর্ম একটু দেখ্ নইলে হরিহর একা কতদিক সামলাবে? ও ওদিকে সারাদিন হেঁসেল নিয়ে পড়ে আছে আর মধ্যে থেকে জ্যেঠুর অযত্নের একশেষ। তোর মত অপদার্থ যদি কেউ থাকে ----।"

দুলু ঘাড় হেঁট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটা রোমাঞ্চকর উপন্যাস এনেছিল শৈলেন। বইখানা পড়তে শুরু করে আর অর্ধপথে নামিয়ে রাখতে পারলো না। ফলে শুতে রাত হল শৈলেনের। সকালে ঘুম ভেঙে দেখে জানলার বাইরে চড়চড়ে রোদ্দুরে ভেসে যাচ্ছে চারিদিক। সুজন ব্যাজার মুখ করে বসে আছে।

"কি ব্যাপার? ডাকিসনি কেন?"

"ভাবলাম, দেরী করে শুয়েছিস। তাছাড়া সারাদিন তো বসে বসে মাছি মারা শুধু, সাত তাড়াতাড়ি উঠেই বা কি করবি?"

নীতীশের পিছন পিছন হরিহর চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকলো। সুজন বললো, "দুলু কোথায় ?"

হরিহর বললো, "রান্নাঘরে।"

এমন সময় দূর থেকে খোল করতালের আওয়াজ ভেসে এলো।

শৈলেন চমকে উঠে বললো, "ওটা আবার কিসের আওয়াজ? বাজনা বাজে কোথায়?"

সুজন বিরক্তির সুরে চাপা স্বগতোক্তি করলো, "গেঁইয়াদের কারবারই আলাদা।"

নীতীশ বললো, "তোকে বলতে ভুলে গেছি। কাল একদল সন্ন্যাসী এসেছে গ্রামে। প্রয়াগে কুম্ভমেলায় স্নান করতে যাচ্ছে ওরা। হিমালয় থেকে মাস দুই আগে নেমেছে। হেঁটেই নাকি পাড়ি দিয়েছে এতটা পথ।"

শৈলেন চিন্তিত মুখে বললো, "অনেক সময় ফেরারী আসামী, ডাকাত, এরা সব এরকম সন্ন্যাসীর ভেক ধরে ঘুরে বেড়ায়। তক্কে তক্কে থাকে। মওকা বুঝলেই খোল করতাল ফেলে ছোরা-বন্দুক বার করে।"

হরিহর জলখাবারের প্লেট নামাতে নামাতে বললো, "আজ্ঞে এনারা চোর ডাকাত নয়। আসল সাধু।"

"কি করে বুঝলে?"

"সকালে কর্তামশায়ের হুকুমমত সিধে পৌঁছতে গিয়েছিলাম। নিষ্ঠাবান সাধু সব, সাক্ষাৎ মহাদেবের মত রূপ। দেখলেও পুণ্যি হয়।"

"সিধেয় কি দিয়ে এলে?"

"কর্তাবাবু বললেন দশ সের চাল, সোনামুগের ডাল সেরটাক, এক কাঁদি কলা আর গাওয়া ঘি। আর সওয়া টাকা দক্ষিণা।"

শৈলেন হেসে বলে, "চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘোরার চেয়ে সন্ন্যাসীগিরি অনেক বেশি ভাল। পেশা হিসেবে মন্দ নয়, কি বল! মূলধনও লাগে কম - শুধু একটা কলকের খরচা আর গোঁফ দাড়ি।"

হরিহর প্লেটে করে গরম লুচি এনে দিচ্ছে আর তিন বন্ধু খেয়ে চলেছে গাল-গল্পের ফাঁকে ফাঁকে। হঠাৎ সুজন গলায় হাত দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো।

"কি হয়েছে সুজন, কি কষ্ট হচ্ছে বল !"

সুজন তখন রীতিমত হাঁপাচ্ছে। ওরা ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে দরজা জানলা ভাল করে খুলে দিলো। সুজনের মুখ চোখ লাল

হয়ে গেছে।

অতি কষ্টে থেমে থেমে বললো, "নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। উঃ!"

শম্ভুনাথ খবর পেয়ে ভীষণ চিন্তিত হয়ে উঠলেন। সুজনকে লালগঞ্জে পাঠানো উচিত কিনা এ বিষয়ে আলোচনা হ'ল। তবে আর একটু সামলে না নিলে এ অবস্থায় অতখানি পথ পাড়ি দিতে পারবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলো সবাই। হিতে বিপরীত না হয় শেষে। ঘণ্টা দুয়েক কেটে গেল। অবস্থার এতটুকু উন্নতি নেই। শেষে লালগঞ্জ থেকে ডাক্তার আনানো স্থির হ'ল। সুজনকে এই অবস্থায় ফেলে শৈলেন অথবা নীতীশের যাওয়া চলে না। হরিহরের হাতে লালগঞ্জের ডাক্তারকে চিঠি লিখে দিলো শৈলেন, সুজনের অসুখের লক্ষণ ও গুরুত্ব জানিয়ে। উনি যেন হরিহরের সঙ্গে পত্রপাঠ চলে আসেন ওষুধপত্তর নিয়ে। হরিহর দুপুর নাগাদ রওনা দিলো।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল। তারপর রাত্রি। সুজন চোখ বুঁজে নির্জীবের মত পড়ে আছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। গায়ে হাত দিয়ে ডাকলে চোখ খুলে শূণ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার চোখ বুঁজে নিঃসাড় হয়ে যায়। সন্ধ্যার পর চণ্ডীমণ্ডপ থেকে প্রবল রবে খোল করতালের আওয়াজ ভেসে এলো। সেই সঙ্গে মিলিত কণ্ঠের সঙ্গীত। বোঝা গেল এই অল্প সময়ের মধ্যেই এনতার ভক্ত জুটে গেছে। বাঘের ভয়ে বেলাবেলি ঘরে ঢুকে খিল আঁটতে অভ্যস্ত গ্রামের লোকগুলো যেন কিসের আশ্বাসে মনের বল ফিরে পেয়েছে আবার।

সুজন চোখ মেলে চাইলো। কিছু যেন বলতে চায়।

ওরা দু'জন ওর মুখের উপর ঝুঁকে শুধোলো, "কি হয়েছে সুজন? কষ্ট হ'চ্ছে খুব? এক্ষুণি ডাক্তার এসে পড়বে ----।"

সুজন দুর্বল গলায় থেমে থেমে বললো, "বড্ড আওয়াজ ---- ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ----।"

শৈলেন বললো, "নীতীশ, দুলুকে চণ্ডীমণ্ডপে পাঠিয়ে ওদের গান বাজনা থামাতে বল।"

নীতীশ বললো, "দুলুর কথা কে শুনবে? তার চেয়ে বরং আমি নিজে গিয়ে বলে আসছি।" ব্যস্তভাবে চলে গেল সে। সুজন চোখ বুঁজে নেতিয়ে পড়লো।

শৈলেন ডাকলো, "সুজন! সুজন!!"

পাশের ঘর থেকে শম্ভুনাথের উদ্বেগভরা স্বর ভেসে এলো, "কি হয়েছে শৈলেন ?"

শৈলেন হন্তদন্ত হয়ে ওঁর কাছে গিয়ে বললো, "জ্যেঠামশাই, সুজন হঠাৎ কেমন হয়ে গেল। তাকাচ্ছে না। সাড়া দিচ্ছে না। উঃ, আমার দোষেই হল এটা। ও বার বার কলকাতায় ফিরে যেতে চাইছিলো, আমিই যেতে দিইনি। হায় ভগবান, আমি মাসিমাকে মুখ দেখাবো কেমন করে?" দুহাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো শৈলেন ।

শম্ভুনাথ বললেন, "ভেঙে পড় না শৈলেন। তোমার কি এখন ভেঙে পড়লে চলে বাবা? তুমি ওর কাছে যাও। একটু গরম দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করো। দুলু! দুলু!"

দুলু সামনে এসে দাঁড়ালো।

"শীগগীর এক বাটি দুধ গরম করে দাদাবাবুকে দে। চামচ আনবি। ---- ডাক্তার তো এখনও এলো না। নারায়ণ, মধুসূদন, দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ---।"

দুলু ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পরমুহূর্তে রান্নাঘরে ঝন ঝন করে বাসন পড়ার আওয়াজ হ'ল এবং সেই সঙ্গে দুলুর আর্তনাদ, "দাদাবাবু, শীগগীর এসো! আগুন লেগে গেছে !"

শৈলেন ছুটে ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে ওর পায়ে ধাক্কা লেগে হারিকেনটা মাটিতে পড়ে গেল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নেমে এলো ঘরে।

শম্ভুনাথ ডাকলেন, "দুলু! দুলু! শৈলেন!"

কেউ এলো না। ওদের আতঙ্কিত আর্তস্বর শুনলেন, "আগুন! আগুন! কে আছ বাঁচাও ----।"

ধোঁয়ার কুণ্ডলী ভেসে আসছে ঘরে। পাশের ঘরে লকলকে আগুনের হলকা দেখা যায়। চারিদিকে ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার। শম্ভুনাথ একলাফে বিছানা থেকে নেমে পড়লেন। দরজার পর্দা দাউ দাউ করে জ্বলছে। মরীয়া শম্ভুনাথ সেই জ্বলন্ত পর্দার পাশ দিয়েই বার হলেন কোনমতে। বাড়ির বাইরে আসতেই দু'জন ছোকরা গোছের সন্ন্যাসী ওঁকে জাপটে ধরলো। বাকী দু'জন আগুন নেভাতে লাগলো।

শৈলেন একমুখ হাসি নিয়ে বললো, "যাক্, জ্যেঠামশাই সকুশলে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন তাহলে। ভাগ্যিস ! তা নাহ'লে সারাজীবন আত্মগ্লানিতে ভুগতে হত আমাদের। মানুষ যে কি ভীষণ স্বার্থপর সে কথা এই রকম বিপদ আপদের সময়ই বোঝা যায় ----।"

একজন ভারিক্কি ধরনের সন্ন্যাসী বললো, "আর বিলম্বে কাজ কি? রথ প্রস্তুত।"

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী বললো, "রথকে এখানে আসতে আদেশ করুন। আমি আর পাদমেকম ন গচ্ছামি। বড় ধকল যাচ্ছে কাল থেকে।"

সুজন ওপাশ থেকে টিপ্পনী কাটলো, "শুনলাম মহাপ্রভুরা হিমালয় থেকে পদব্রজে আসছেন। এখানকার এই সামান্য ধকলেই কুপোকাত হলেন?"

সন্ন্যাসীদ্বয় ঘাড় ঘুরিয়ে সুজনের দিকে তাকিয়ে বললো, "বৎস, মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ করো না।"

সুজন হাসতে লাগলো। খানিক আগের মারাত্মক ব্যারামের ছিটেফোঁটা লক্ষণও নেই আর।

দারোগাবাবু ও চারজন বন্দুকধারী সিপাই নামলো জীপ থেকে।

শৈলেন ছদ্মবিস্ময়ে বললো, "একি, অ্যাম্বুলেন্স্, স্ট্রেচার্, এসব কই? জ্যেঠামশাই যাবেন কি করে?"

দারোগাবাবু শম্ভুনাথের হাতে হাতকড়া পরাতে পরাতে বললেন, "কিচ্ছু চিন্তা করবেন না। সর্বরোগের দাওয়াই আছে পুলিসের কাছে।"

ততক্ষণে আর দু'জন সন্ন্যাসী হাত-পা বাঁধা অবস্থায় হরিহরকে নিয়ে এলো। হরিহর ও শম্ভুনাথকে জীপে তোলা হলে দারোগাবাবু শৈলেনকে বললেন, "কাল সকালে গাড়ি পাঠাবো। আপনারা থানায় চলে আসবেন।"

চণ্ডীমণ্ডপের এক পাশে নীতীশ বজ্রাহতের মত বসে আছে। সেদিকে ইঙ্গিত করে দারোগাবাবু নীচু গলায় যোগ করলেন, "দারুণ শক্ পেয়েছেন আপনাদের বন্ধু। পিতৃতুল্য মনে করতেন যাকে, সেই জ্যেঠামশাই যে এরকম সাংঘাতিক চীজ ---- ।"

জীপদুটো চলে গেল। ভারিক্কি গোছের সন্ন্যাসী নিজের দাড়িতে কষে টান মেরে বললো, "ইস্, কি মোক্ষম করে আটকেছে রে বাবা।"

শৈলেন বললো, "পোশাক-আশাক, মেকআপের জিনিসপত্তর সব লিস্ট মিলিয়ে গুছিয়ে রাখ সুবল। নইলে ক্লাবের মিটিঙে আবার কথা শুনতে হবে।

(উপসংহার)

কলকাতাগামী ট্রেনের একটি কামরা। জানলার কাঁচ বন্ধ করে সুজনের সামনে এসে বসলো শৈলেন।

বললো, "ছুটিটা মন্দ কাটলো না, কি বল?"

উপরের তিনটে বার্থ জুড়ে টান টান হয়ে শুয়ে আছে সুবল, পঙ্কজ এবং নিমাই। শৈলেনের কথা শুনে সুবল কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা তুলে বললো, "না, মন্দ আর কি? গা গতর চূর্ণ হয়ে গেছে এই যা।"

শৈলেন চোখ নাচিয়ে বললো, "কলকাতায় থাকতে তো নাটক নাটক করে মরছিলি সবাই। তা চুটিয়ে নাটক করলি এবার। দু'দিন ধরে গাঁজার কলকে হাতে ছাই মেখে হড়ং বড়ং মন্ত্র আওড়ানো আর ভাবনৃত্য।"

সুবল সোৎসাহে বাঙ্কের উপর উঠে বসলো। নিমাই আর পঙ্কজও।

নিমাই বললো, "ওঃ, সে তো তোরা দেখিসনি। চিমটে বাজিয়ে অ্যায়সা নাচ দেখিয়েছিল না, বাস্ রে ! আমি তো ভাবলাম গাঁজা মাথায় চড়ে গেছে ওর।"

সুবল সলজ্জ হেসে বললো, "ধ্যুস্, গাঁজা টানছিলাম থোড়েই যে মাথায় চড়বে। শুধু লোকের সামনে একটু আধটু গুড়ুক মারছিলাম এ্যাটমস্ফেয়ার ক্রিয়েট করতে।"

সুজন ক্ষুণ্ণস্বরে বললো, "শৈলেন কিন্তু আমাকে একবারও বলেনি যে তোরাই সন্ন্যেসী সেজে চণ্ডীমণ্ডপ গুলজার করছিস। আমি বরাবর জেনে আসছি ওগুলো জেনুইন্ সাধু।"

"ওটা ট্যাকটিকস্, বুঝলি? যার যেটুকু পার্ট সেটুকুতে কন্সেন্ট্রেট্ করলে তবেই টোটাল এফেক্ট ভাল হয়।"

"আর শৈলেন হ'ল ডিরেক্টর্ অফ দ্য হোল শো।"

"আচ্ছা শৈলেন, তোর কখন থেকে শম্ভুনাথবাবুকে সন্দেহ হ'ল বলতো?"

"সেটা বেশ ক'দিন পরে। তবে বাঘের ব্যাপারটা শুরু থেকেই হজম করতে পারছিলাম না। কাছেপিঠে বিশ ক্রোশের মধ্যে বন বাদাড়ের নাম গন্ধ নেই, হঠাৎ বাঘ এলো কোত্থেকে ! তাছাড়া এ বাঘ শুধু মানুষই মারছে, তাও বড় বড় জোয়ান মর্দ দেখে। সাধারণত দুর্বলতর প্রাণী মারাই যেখানে স্বাভাবিক। শম্ভুনাথবাবুকে সন্দেহ করতে সুরু করলাম লালগঞ্জ থানার নতুন দারোগার সঙ্গে কথা বলার পর। শম্ভুনাথবাবু সমানে পুলিসের নিন্দাবাদ করেছেন এ ব্যাপারে তাদের নিষ্ক্রিয়তার জন্যে। কিন্তু থানায় গিয়ে অন্যরকম ধারণা হ'ল আমার। শম্ভুনাথবাবুই ঘটনার মারাত্মকতা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আগাগোড়া। পুরোনো দারোগার সঙ্গে এ ব্যাপারে তাঁর যোগসাজস ছিল কিনা সেটা অনুমান সাপেক্ষ। পুরোনো দারোগা ঘুষ খাওয়ার দায়ে রাতারাতি স্থানান্তরিত হন। সেটা অন্য ব্যাপারে হলেও এর থেকে ভদ্রলোকের মনোবৃত্তি আন্দাজ করা যায় এবং চণ্ডীপুরের খুনের তদন্ত শেষ হ'লে দারোগার ভূমিকাও পুরোপুরি প্রকাশ পাবে।

"বাঘের ডাকের রহস্য উদঘাটন করে সর্বপ্রথম দুলু। সে-রাতে দীঘিতে ছিপ পাততে গেছিল সে। ভেবেছিল রাতে মাছে টোপ খেয়ে বড়শিতে গেঁথে থাকবে, ভোর রাত্রে তুলে আনবে মাছটা। টোপ লাগিয়ে ছিপ ফেলছে নিঃসাড়ে, হঠাৎ আবছা অন্ধকারে খানিক দূরে কাউকে দেখতে পেলো। মানুষটাকে শনাক্ত করতে না পারলেও সেটা যে দু'পেয়ে মানুষই, বাঘ নয়, তা পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিল দুলু। কিন্তু সেই মানুষটাই যখন হঠাৎ অবিকল বাঘের মতন গর্জন করে উঠলো, দুলু তো ভয়ে ভিরমি খাবার দাখিল। লোকটা চলে যেতেই পড়ি-কি-মরি ছুট লাগালো দুলু। রাস্তায় কতবার মুখ থুবড়ে পড়লো, সারা গা কেটে কুটে একসা, তবু কোনমতে বাড়ি পৌঁছতে পেরেছিল ছেলেটা। দুলু যখন সেই রাতে ভয়ে আধমরা হয়ে বাড়ি ফিরলো, আমি, সুজন আর নীতীশ সেখানে ছিলাম। তার খানিক আগে সুজন চা খেতে চাইলে নীতীশ হরিহরকে ডাকতে গিয়ে ফিরে এলো। শুনলাম দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। আমার তখনি খটকা লেগেছিল। দুলুকে অ্যাণ্টিটিটেনাস্ দেবার নাম করে তখনকার মত সরিয়ে ফেলি কারণ ওর মুখ থেকে ঘটনাটা ফাঁস হয়ে

গেলে ওর প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল।

"সেই দিনই এখানকার কাণ্ডকারখানার বিবরণ জানিয়ে তোদের এখানে আসার জন্যে চিঠি লিখে দিলাম। শহর থেকে ফেরার সময় একটা টয় পিস্তল কিনে হরিহর ও শম্ভুনাথবাবুকে দেখিয়ে বললাম, সেটা সত্যিকারের পিস্তল, থানার দারেগাবাবু আমাকে দিয়েছে। আরেকটা ব্যাপারেও সন্দেহ ঘন হয়। বাঘের কথায় একদিন বাঘছালের কথা এসে যায়। নীতীশের জ্যেঠামশাই এককালে বার্মার জঙ্গলে বাঘ শিকার করেছিলেন। ওঁর শোবার ঘরে দেয়াল জুড়ে বড় বড় বাঘছাল টাঙানো থাকতো। এবার আর সেগুলো দেখিনি। শম্ভুনাথবাবু বললেন ওগুলো দেখলে বর্তমান পঙ্গু অবস্থার বেদনা আরও বেশি বুকে বাজে বলেই নাকি বাঘছাল সরিয়ে ফেলা হয়েছে গোদামঘরে। তা না হয় হ'ল। কিন্তু গোদামঘরে যে বাক্সে বাঘছাল রাখা হয়েছে তাতে অত বড় তালা ঝুলছে কেন? বাড়ির মধ্যে দিয়ে ছাড়া ও ঘরে যাওয়া যায় না, কাজেই চুরির ভয়ে নিশ্চয় তালা দেওয়া হয়নি ! আমার মনে হ'ল বাড়ির অন্যদের দৃষ্টিপথ থেকে বাঘছালগুলো সরিয়ে দেওয়াই আসল উদ্দেশ্য যাতে চণ্ডীপুরে বাঘের হামলা সম্বন্ধে আসল তথ্যটা হঠাৎ কেউ ধরে না ফেলে। নীতীশের সুরক্ষার জন্যে সুজন আমার কথামত হাঁপানির দোহাই দিয়ে ঘর বদল করে।

"সুজনের অসুখের পার্টটা সত্যিই গ্যাণ্ড হয়েছিল। ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি যে ওটা অভিনয়। হরিহর গরুর গাড়ি হাঁকিয়ে শহর পানে ডাক্তারের খোঁজে চললো ----।"

সুবল খেই ধরলো, "গ্রামের পথে অপেক্ষা করছিলাম আমরা। ওকে পাকড়ে আনলাম আমাদের আখড়ায়। শিষ্যবেশে দু'জন কন্‌স্টেবল্‌ও ততক্ষণে এসে ভিড়েছে ----।"

"হ্যাঁ, নতুন দারোগা মিস্টার মিশ্র খুবই সাহায্য করেছেন।"

"আমরা ওঁকে সাহায্য করেছি বল। খুনী ধরা ওদেরই দায়িত্ব, আমাদের নয় ----।

"শম্ভুনাথবাবুর মুখোশ পুরোপুরি খুললো বিজয়া দশমীর দিন। প্রতিমা বিসর্জনের পর ফেরার পথে একটা লেজ নড়তে দেখা গেল। সেই

সঙ্গে এক ঝলক ডোরাকাটা কিছু। স্বভাবতই সবাই ভাবলো সেটা বাঘই। কিন্তু গোয়াল ঘেঁষে বাঘ দাঁড়িয়ে থাকলে গরু কখনও অমন নিশ্চিন্ত মনে জাব চিবোতে পারে না। কাজেই বাঘটা যে সত্যি বাঘ নয় সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হ'লাম আমি। তাছাড়া পুরো বাঘটাকে তো দেখেনি কেউ। দেখেছে শুধু একটা লেজ আর ঝোপের ফাঁকে এক ফালি বাঘছাল। বাঘের গর্জন যদি মনুষ্যজাত হ'তে পারে তবে এই সামান্য 'শো' টুকুই বা কেন মানুষের কারসাজি হ'তে পারে না? গোয়ালঘরের পাশে কয়েকটা বাঘের পায়ের ছাপের মত দাগ দেখলেও সেগুলো এমনভাবে ছড়ানো ছিল যা স্বাভাবিক মনে হয়নি। বাঘটা যেন হঠাৎ শূণ্য থেকে পড়ে শূণ্যেই মিলিয়ে গেছে আবার।

"শম্ভুনাথবাবু সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হ'বার জন্যে আমি মনে মনে একটা মতলব ঠিক করলাম। আমার ডান হাতের আঙটিতে একটা আলপিন আটকে নিলাম। সেদিন রাত্রে ওঁকে বিজয়ার প্রণাম করার ছলে ওঁর পায়ে আলপিনটা বিঁধিয়ে দিতেই ওঁর মুখ যন্ত্রনায় বিকৃত হয়ে উঠলো। অবশ্য চতুর শম্ভুনাথ ভান করলেন যেন যন্ত্রনাটা আধ্যাত্মিক। মা দুর্গার যথাযোগ্য পূজার্চনা করতে পেলেন না বলেই এই মানসিক বেদনা। ওঁর যে সত্যি প্যারালিসিস্ টিসিস্ কিচ্ছু হয়নি সে কথা আমি জেনে গেলেও সর্বসমক্ষে ওঁর মুখোশ খুলে দেওয়া প্রয়োজন ছিল। তাই অগ্নিকাণ্ড রচনা করতে হ'ল শেষ অবধি। অবশ্য বিশেষ কিছু লোকসান হয়নি আগুনে। একটা পর্দা পুড়েছে শুধু। এক বোঝা পাতকাঠি আগে থেকে এনে রেখেছিলাম লালগঞ্জ থেকে। স্মোকবম্ও থানা থেকেই দিয়েছে ----।

"শম্ভুনাথবাবু অতি ধুরন্ধর লোক। আমরা ওঁর আগের ইতিহাস জানি না। শম্ভুনাথ নীতীশের বাবা অবনীনাথের বড় ভাই হ'লেও বিষয় সম্পত্তি সব অবনীনাথের নামে ছিল। শম্ভুনাথ কিশোর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর গ্রামে তাঁর পুনরাগমন ঘটে অবনীনাথ ও তাঁর স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুর পর। গ্রামে এসে নীতীশের গার্জেন হিসেবে গেড়ে বসতে বেগ পেতে হয়নি তাঁকে। তাঁর চতুর অভিনয়ে সবাইকে সহজে বশে এনেছিলেন। নীতীশকে তোমরা ভাল করেই জানো। স্নেহপ্রবণ, ট্রাস্টিং, আদর্শবাদী ছেলে। এত বছর বোর্ডিংএ এবং হস্টেলেই কেটেছে ওর। মাসে মাসে খরচের টাকা পাঠিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট ছিলেন শম্ভুনাথ। গ্রামে নিরঙ্কুশ রাজত্ব করে এসেছেন। কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষার

আগে নীতীশ যখন চিঠিতে জানালো এবার সে গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে, শম্ভুনাথের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। পত্রপাঠ কাশীর গুরুদেবের নাম করে কোন গুরুর কাছে যে মন্ত্র নিতে গেলেন, সেটা আন্দাজ সাপেক্ষ। তারপর সব পরিকল্পনা পাকা করে প্যারালিসিসের রুগীর ভেক ধরে ফিরলেন। সঙ্গে সাকরেদ হরিহর।

সোজাসুজি খুন করে ফাঁসিতে লটকানোর মত কাঁচা ছেলে নন শম্ভুনাথ। পাকা খেলুড়ের মত জাল বিছোলেন। চণ্ডীপুরে বাঘের উপদ্রব শুরু হ'ল। বাঘের উৎপাত অনেকটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত, কাউকে বলার কিছু নেই। বুনো বাঘ নিজের খেয়াল খুশি মত মানুষ মারতে মারতে ওঁর ভাইপোকেও মারতো একসময়। উনি অনেক বুক টুক চাপড়ে তারপর চোখ মুছে বিষয়ভার গ্রহণ করতেন নেহাতই অনন্যোপায় হ'য়ে। কিছুদিন পর বাইরে গিয়ে আবার সুস্থ হয়ে ফিরে আসতেন। গ্রামের লোকেরা অমুক ডাক্তার কিংবা তমুক যোগীর অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা শুনে চমৎকৃত হ'ত। শুধু ভাইপোর অপঘাতের মূলে স্নেহশীল জ্যেঠামশাইয়ের ভূমিকাটা ঢাকা রয়ে যেতো চিরদিনের মত। নরভক্ষী বাঘের উপদ্রবও থেমে যেতো একসময় এবং যথোচিত শান্তি স্বস্ত্যয়নের পর গ্রামের লোকেরা স্বাভাবিক নিয়মে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ফিরে যেতো আবার ----।"